নাও ভেসে চলে

রথীন কর

Manik Bandopadhyay with his first four or five volumes convinced us that he was about the most completely equipped writer in fiction we had ever have. A belated Kallolean, he looked like being the last and the best sequence in the process of change our fiction had just been going through...we found in him both the rythm and the impulsion of energy, a dramatic, impersonal, almost intangible style\ in his novel of East Bengal boatmen the most beautiful use of dialect in our literature.
[An arce of Green Grass - Buddadeva Bose, Papyrus, 1982 p. - 94]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই অনবদ্য মূল্যায়নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রথম চার-পাঁচটি উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন প্রকাশনার ক্রম অনুসারী চতুর্থ উপন্যাসটি হল পদ্মানদীর মাঝি। প্রকাশকাল ২৮মে ১৯৩৬। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে পূর্ব্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, কিন্তু পত্রিকাটি সাময়িকভবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে জননী (মার্চ ১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (জুলাই ১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (মে ১৯৩৬) এই তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে 'অতসী মামী'র হাত ধরে যে তরুণটির বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ ঘটেছিল বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে, পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যিক হিসেবে সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে তাঁর চিরকালীন উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পদ্মানদীর মাঝি প্রমত্ত, খেয়ালিপদ্মার একটি বিশেষ জনাঞ্চল কেতুপুরকে কেন্দ্র করে রচিত এবং সেখানকার অধিবাসী যারা জীবিকাসূত্রে ধীবর বা মাঝি তাদের জীবনকাহিনি নিয়ে অলংকৃত।

নদী মানে অখণ্ড প্রবহমানতা, বিরতিহীন সময়ের হাত ধরে চলা, নদী মানে সভ্যতা, নদী মানে জনজীবন, নদী মানে জন-জাতি যাদের জীবনধারা নদীকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়। নদী মানে নদীর রূপোলি ফসল— মাছ এবং সেই মাছমারাকে ঘিরে সচলজীবনবৃত্ত। নদী মানে জেগে ওঠা নতুন চর— চরের অবলুপ্তি। নদী মানে বানভাসি মানুষের হাহাকার—নতুন করে ঘর বাঁধার আকুতি, নদীর স্রোতে সঙ্গে মিশে যায় মানুষের জীবন প্রবাহ। নদীর কলধারায় ভেসে চলে মানুষের দুঃখসুখের আলাপচারিতা, নদী মানে নদী-নির্ভর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রবহমানতা। নির্দিষ্ট সময়বৃত্তে নদীকেন্দ্রিক গোষ্ঠীজীবনের অতীত থেকে বর্তমানের যাপিত জীবন ও লালিত সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে থাকে নদী। সেজন্য বিশ্বসাহিত্যে নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবনকে নিয়ে রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, লোককাহিনি। বাংলা সাহিত্য ও নদীর অনুষঙ্গ বিভিন্নভাবে এসেছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। কিন্তু এযাবৎ নদীর ভূমিকা থেকেছে আলংকারিক, উপরিভাগে প্রসাধকরূপে, নদীভিত্তিক বৃত্তিজীবন, সংস্কৃতিমগ্নতা, নদীর উদ্দামতা ও ঔদাসীন্য বা সামগ্রিকভাবে নদীবৃত্তান্ত মূল কাহিনি ও অন্তর্গত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেনি। এই আত্মীকরণে সার্থক প্রতিফল প্রথম সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে। এই প্রথম লক্ষিত হল উপন্যাসের নরনারীর জীবনকথা, স্থানীয় আচার, সংস্কার, অর্থনীতি প্রভৃতির সঙ্গে নদীপ্রবাহ, নদী খেয়ালি চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে বেশ কিছু নদীকেন্দ্রিক ও নদীনির্ভর জীবিকাভিত্তিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই সব উপন্যাসে কখনো নদী যাপিত জীবনের প্রতীক, কখনো পাত্রপাত্রীর চরিত্রবিকাশে সহায়ক, কখনো নির্মাণ—বিনির্মাণের নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। নদীপ্রকৃতির কাব্যময়তা, নদীর খেয়ালি চরিত্র, জীবিকার উৎস হিসাবে নদী জীবন সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হিসাবে নদী—এই সব উপন্যাসে স্বমহিমায় বিরাজমান। মূল সুরটি হল বৃত্তিজীবী নদী নির্ভর মানুষগুলির যাপনচিত্র। পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরে যেহেতু অন্যান্য উপন্যাসের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, সেজন্য বিস্তৃত আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে তিনটি পাঠক প্রিয় বহুচর্চিত উপনাস, যেগুলিতে নদী জীবন মূল কাহিনিবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে ও পরিবেশ চেতনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রক্তবাহী শিরার মতো। এগুলি হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, সমরেশ বসুর গঙ্গা এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম। অবশ্যই মুখ্যচরিত্রে থাকবে রূপমতী সর্বনাশা খেয়ালি পদ্মা এবং তৎকেন্দ্রিক জীবনআবর্ত নিয়ে রচিত পদ্মানদীর মাঝি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতে পুরোনো মূল্যবোধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। সমাজ-সংসার, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতির চিরাচরিত ধারণা আমূল পরিবর্তিত হল। ব্যক্তিমানুষের মনোজগতেও সেই পালাবদলের ঢেউ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রুশ বিপ্লব এক অমোঘ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠল। বিচ্ছিন্নতাবোধের বিচিত্র মানসিকতায় আবর্তিত হতে থাকে ব্যক্তিমানুষ এবং এর প্রভাব এসে পড়ল বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে। পূর্বজ কথাকারদের রচনায় যেসব অভিজাত, উচ্চমধ্যবিত্ত চরিত্রদের দেখা যেত, তার পরিবর্তে অন্ত্যজ মানুষের জীবনালেখ্য কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল। নাগরিক জীবনচর্চার বাইরে অবস্থিত বৃহত্তর পল্লিজীবন, তাদের বিচিত্র জীবিকা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নানান সংস্কারে নিমজ্জিত গ্রামীণ মানুষেরা, তাদের দুঃখ-বেদনা, হাসিকান্নার পটছবি, তাদের বঞ্চনার কথা কথাসাহিত্যের মূল উপজীব্য হয়ে উঠল। এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে লক্ষিত হয় কল্লোলীয় সাহিত্যে। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যিককুল প্রভাবিত হয়েছিলেন পশ্চিমি সাহিত্য দ্বারা। ইংরেজি সাহিত্য ছাড়াও ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, রুশ কথাসাহিত্যের ঢেউ বাংলাসাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে আছড়ে পড়ল। প্রচলিত জীবনবোধ, ধ্যানধারণা আদর্শের প্রতি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হল এবং এই বিদ্রোহের আদর্শের প্রতিবাদী মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা। কল্লোল প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯২৩ সালে)। কালিকলম প্রকাশ পায় এর তিন বছর পরে। কল্লোলীয় লেখকদের ভাষার তীক্ষ্ণতা, প্রকাশ ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে উল্লাস জাগালেও এই প্রচেষ্টাকে তিনি 'রোমান্টিক ন্যাকামি' এবং তীব্র বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী বলে চিহ্নিত করেছেন। কল্লোলের কুলপুরুষ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' রূপে চিহ্নিত করলেও মানিক সে অর্থে কল্লোলীয় উজানে গা ভাসিয়ে দেননি। বুদ্ধদেব বসুর সতর্ক মূল্যায়ন 'a belated Kollolean'। মানিকের মৃত্যুর পর (৩

ডিসেম্বর ১৯৫৬) কবিতা পত্রিকায় ১৯৫৭র প্রথম দিকে যে শোকনিবন্ধ লেখেন বুদ্ধদেব, তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'তিরিশের যুগে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন তাদের বুঝতে দেরি হয়নি সে সদ্যমৃত ''কল্লোলের'' সর্বশেষ বিলম্বিত ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোল-কে ডিঙিয়ে মানিক বিচিত্রা-য় চলে এসেছিলেন, পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। বিদেশি উপন্যাসের চরিত্রকে দেশি পোশাকে উপস্থাপিত করেননি তিনি। এ ব্যাপারে বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্তর সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য লক্ষণীয়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর গ্রন্থে মানিক উপন্যাসকে তিনটি পর্বে বিভাজন করতে চেয়েছেন। প্রথম পর্বে আছে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মানদীর মাঝি, দ্বিতীয় পর্বে রেখেছেন চুতষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে আছে শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য প্রভৃতি। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব বা ভাববাদ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হওয়ার পর মার্কসীয় তত্ত্ব বা বস্তুবাদ কোনটি কীভাবে মানিকের বিভিন্ন পর্বের উপন্যাস ও গল্পকে প্রভাবিত করেছিল সে প্রতর্কে না গিয়ে একথা বলা যায় যে, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল নবতর ক্লেদ ও গ্লানির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনে, তেমনি শোষণ, অবিচারের ঘটনাপ্রবাহে অবহেলিত মানুষের নিরুপায়, অসহায় চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। হাতে তুলে নিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। জীবন সম্পর্কে এক নির্মোহ, যুক্তিনির্ভর, নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক চেতনায় ভাস্বর হয়ে আছে তাঁর কালজয়ী বিভিন্ন রচনা। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, রোগজর্জরিত জীবন নিয়েও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন আটত্রিশটি উপন্যাস, ষোলোটি গল্পগ্রন্থ, একটি কাব্য, একটি নাটক, কিশোরগল্প ও কিছু আত্মসন্ধানী রচনা। এই পথপরিক্রমায় তিনি স্বকীয় প্রতিভায় অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছেন। নিরীক্ষিত জীবনের ছবি এঁকেছেন নিজস্ব পদ্ধতিতে। কথাশিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে, ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ। বোধ হয় রঞ্জনরশ্মিও ছিল। এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে তার আগে দীর্ঘকাল কেউ দেখেননি।' (অন্বিষ্ট মাঘ ১৩৭৮) এই 'ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ' দিয়ে জীবন অবলোকনে তাঁর কোনো ফাঁকি ছিল না। তাঁর নিজের কথায়, 'জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না।...যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সে জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।' (লেখকের কথা) তাঁ নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরারো হয়ে উঠেছিল, সাহিত্য নিয়ে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিল তিনি। জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা বাহ্যিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ - পরা হীনতা, স্বার্থপরতা তাঁর মনকে বিষিয়ে দিয়েছিল। তাই এই জীবন থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটোলোক চাষাভুষোদের মধ্যে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চেয়েছিলেন। নিন্দা, প্রশংসায় বিচলিত বা উৎফুল্ল না হয়ে 'খাঁটি লোক কবে হবো' এই নিরন্তর জিজ্ঞাসা তাঁকে ক্রম উত্তরণের পথে নিয়ে গিয়েছে।

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই মানসিকতার ব্যক্তিটি অঙ্কশাস্ত্রে সাম্মানিক নিয়ে পড়ার সময় বাড়ির লোকের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার ফলে সাহিত্য করতে আসবেন। কল্লোলের সোরগোলের সময় মানিক উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাহিত্য জগতে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং এই সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্ধকারে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।

মাত্র আটচল্লিশ বছরের ইহলৌকিক জীবন ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পিতার চাকরি সূত্রে মানিকের ভ্রাম্যমাণ ছাত্রজীবন কাটে দুমকা, সাসারাম, তমলুক, কাঁথি, শালবনী, মহিষাদল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, টাঙ্গাইল প্রভৃতি এলাকায়। এই সদা পটপরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'ভদ্র জীবনের সীমানা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে।' চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে টাঙ্গাইল জেলা স্কুলে পড়ার সময় মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হতেন তিনি। দু-চার দিন পরে তাঁকে আবিষ্কার করা হত টাঙ্গাইলের মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে তাদের নৌকোয়। লেখার তাগিদে পরবর্তীকালে আত্মবিশ্বাসী মানিক পরিবারের সুরক্ষা বলয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না।

ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষি- মজুর, মাঝি-মাল্লাদের ঋজু প্রান্তিক জীবন চিত্রায়ণের আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হল পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে। এর আগে যে তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার প্রেক্ষিত এবং পটভূমি ভিন্ন। পদ্মা বিধৌত পুববাংলার একটি অখ্যাত এলাকা কেতুপুর অঞ্চলের ধীবরজীবনের যাপনচিত্র, সংস্কৃতি-সংস্কার, আবেগ, অনুভূতি, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ধারাবিবরণী শিল্পিত দক্ষতায় পরিস্ফুট হয়েছে পদ্মানদীর মাঝি-তে। এর আগে এ ধরনের প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়নি। পদ্মানদীর মাঝির-র পটভূমিতে লেখক যে জীবনধারা বিধৃত করেছেন তা একাধারে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিমগ্নিম। গ্রন্থটির প্রথম পর্যায়ের এ অতিবাস্তব অথচ কাব্যিক আবরণে গোষ্ঠীজীবনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

> পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদী বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান, অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়।
>
> (পদ্মানদীর মাঝি/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২/ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি— পৃষ্ঠা : ১৩) নদীবক্ষে অন্ধকারে এই দুর্বোধ্য সংকেত জেলেসমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের প্রতীক। নৌকোর ম্লান আলো সে অন্ধকার দূর করতে অপারগ।

কুবের মাঝি মাছ ধরছিল। দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকোতে আছে আরও দুজন ধনঞ্জয় ও গণেশ। আরও দু-মাইল উজানে কেতুপুর গ্রাম। কেতুপুর গ্রামে পুব দিকে গ্রামের বাইরে জেলে পাড়া। এই ধীবর পল্লিকে ঘিরেই উপন্যাসের বিস্তার। শুরুতেই জেলেদের অসহায়ত্ব ও বিপর্যস্ত জীবনধারার এক বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠেছে। নৌকোটি ধনঞ্জয়ের, জালও তার। কাজেই জ্বরে আক্রান্ত কুবেরকে তারই নির্দেশ মতো কাজ করতে হয়। কে এই কুবের? 'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটেলোক।' সেজন্য সে ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রতারিত হয়, বাবুদের কর্মচারী শীতল মাছ নিয়ে দাম দিতে চায় না,

চালানবাবু কেদারনাথ প্রতি একশো মাছে পাঁচটি মাছ চাঁদা হিসেবে নেয় জেলেদের কাছ থেকে। জালহীন, নৌকোহীন শ্রমজীবী কুবের একাই যে বঞ্চনার শিকার তা নয়, জেলে পাড়ার রাসু, আমিনুদ্দি, গণেশ ও অন্যান্যরা নানারকমের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার আবর্তে নিমজ্জমান।

গোষ্ঠীগতভাবে সমগ্র সম্প্রদায়টি যে বঞ্চিত সেটি লেখক স্বল্পকথায় পাঠককে অবহিত করেছেন। 'চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে।...স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ১৯)

এরই মধ্যে অসহায় বঞ্চিত মানুষগুলির জীবন চক্র প্রবাহিত হতে তাকে। 'জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না।...জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সংকীর্ণতায়।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ২০) ঈশ্বর থাকেন গ্রামের ভদ্রপল্লিতে। কালবৈশাখীর তাণ্ডব, বর্ষার জল, শীতের আঘাত সহ্য করেই এদের জীবন যন্ত্রণা।

এই সর্বব্যাপী হতাশা আর নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্যে এরা একে অপরকে আঁকড়ে ধরে। পরিবার পরিজন হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে রাসুর ময়নাদ্বীপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে সভা হয়েছিল, তাতে সমগ্র জেলেপাড়ার যোগদান এবং রাসুর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন সামগ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। রথের মেলা, দোল, বাবুদের বাড়ির পূজা প্রভৃতি উৎসবে নৈমিত্তিক দুঃখদুর্দশা ভুলে পড়শিদের যোগদান সমাজজীবনের প্রবহমানতাকে তুলে ধরেছে। পীতমের মেয়ে যুগী বিপদে-আপদে সকলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, কোনো মাঝি নদীবক্ষে বিপদে পড়লে মাঝিরা যে সাংকেতিক ভাষায় অর্থাৎ এক প্রকার ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান করে তা পারস্পরিক সহমর্মিতার নির্দশন। রাসু এভাবেই অন্য নৌকোয় কেতুপুর পৌঁছোতে পেরেছিল। লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়েও জেলেপাড়ার অধিবাসীদের সমাজ চেতনার রূপটি ধরা পড়ে গোষ্ঠীগত মঙ্গলসাধনায়। 'ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠোনে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে— ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন।' ভদ্রপাড়ার প্রান্তসীমায় জেলেদের জীবন এভাবেই কেটে যায়। উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক মরমি মন দিয়ে, জাদু কলমের স্পর্শে যে অরুন্তুদ চিত্র অঙ্কিত করেছেন সেটিই উপন্যাসের চালিকাসূত্র হয়ে উঠেছে। প্রান্তজীবনের বুকছেঁড়া দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় বারে বারে বিভিন্ন পটভূমিতে। গ্রামীণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের দৈনন্দিনতার প্রেক্ষাপটে নিখুঁত পরিমিতিবোধের চিরন্তন মানবপ্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন লেখক। ফাদার পিয়ের ফাঁলোর বিশ্লেষণে, সাধারণ মানুষের চিত্রাঙ্কনে মোঁপাসার যে উপেক্ষাপূর্ণ আভিজাত্যের ভাব আছে — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা নেই। বরং সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ করতেন। এই মানসিকতায় গোর্কির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন ফাঁলো।

সমাজচেতন গোষ্ঠীবদ্ধতা একুশ বছর পরে প্রকাশিত আর এক অবিস্মরণীয় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস সমরেশ বসুর গঙ্গা-তেও পরিলক্ষিত হয়। সাঁইদার নিবারণ মালোর নেতৃত্বে 'মাছমারা'র দল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গঙ্গায় যায় মাছ ধরতে। ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, ফরিদকাঠি, ইটিঙে, টাকি, সন্দেশখালি, ন্যাজাটা, সাহেবখালি তাবৎ পূর্ব-উত্তর আর পূর্ব-দক্ষিণ থেকে মৎস জীবীরা মিলিত হয় গঙ্গাবক্ষে। সমগ্র মরশুমটির জন্য তাদের বাসস্থান নদীর ওপরে ভাসমান 'শাবরে'। দলবদ্ধভাবে তারা থাকে, একে অপরের দৈনন্দিনতার অংশীদার—এও এক কঠোর, কষ্টপ্রদ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী অস্তিত্ব। তাদের 'বউঝিরা জাগে গ্রামে— সতর্ক চক্ষু জাগে সমুদ্রে নীলাম্বুরি অন্ধকারের বুকে শাবরের আনাচে কানাচে মাছের চকের পিছনে পিছনে, বনের অদৃশ্য দানোর সঙ্গে,' চৈত্রমাসে মাছমারাদের দুর্দিন উপস্থিত হয়। এই দুঃসময়ে তারা সমবেতভাবে গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে কাল কাটায়। অসময়ে বিবেক তাদের বিবেকছাড়া কাজ করায়। সেজন্য ঘরে বাইরে মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা আর নেশাভাঙ চলে। গঞ্জে মকর পুজোয় সমবেত আনন্দ উৎসবও চলে।

গঙ্গা-র সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের মালোজীবনের মহাভারত তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)। অদ্বৈত ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের অন্দরমহলের মানুষ। নিজেকে বলতেন, 'জাউলার পোলা'। আপন জীবন অভিজ্ঞতায় জারিত তাঁর শিল্পনৈপুণ্য। চারিট খণ্ডে বিধৃত উপাখ্যানটি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'যেমন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোন পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়।' ব্যক্তিবিশেষ নয়। একটি জাতিসত্তার সভ্যতার ইতিহাস, সত্তার অবলুপ্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, লোকাচার, সংস্কৃতি তিতাস পারের ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রথমেই পরিবেশ পরিচিতি। 'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।...' মেঘনা পদ্মার বিভীষিকা তার মধ্যে নাই— তিতাস শাহী মেজাজে চলে। এই তিতাসের তীরে মালোপাড়া। 'নদীটা যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়াছে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা — তার দিনের কলবর রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়ে না। দক্ষিণ পাড়াটাই গ্রামের মালোদের।' (তিতাস একটি নদীর নাম/ অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র পৃষ্ঠা : ৪১৩)

প্রবাস খণ্ডের প্রথমে 'মাঘমণ্ডুল' ব্রতের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। —কুমারীদের ব্রত এটি। সমবেত অংশ গ্রহণই এর বৈশিষ্ট্য। শুকদেবপুরের দোল-উৎসব, সমবেত নামগান— মালোপাড়ার নানা আচার অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীজীবনের নকশিকাঁথাটি নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। জন্মমৃত্যু বিবাহ সব কিছুতেই এদের উৎসবের সমারোহ। ব্রাত্যজীবনের বিত্তহীনতার বেদনা চাপা পড়ে যায় তিতালের মতো বহমান সংস্কৃতির আবহে।

পদ্মা, গঙ্গা, তিতাসের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নদীর উজান বেয়ে অনেকদূর গিয়েছিলাম— ফিরে আসি কেতুপুরে। এখানে গোষ্ঠীজীবনের সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে ব্যক্তিগত যাপনচিত্ত। মুখ্য চরিত্রাভিনেতা কুবের, হোসেন মিয়া, কপিলা এবং অনেকাংশে কুবেরের পঙ্গু স্ত্রী মালা। পার্শ্বচরিত্রে আছে রাসু, পীতম, গণেশ, যুগল, এনায়েত, আমিনুদ্দি, জমিদার অনন্ত

তালুকদার, কুবের কন্যা গোপী, কপিলার স্বামী শ্যামাদাস প্রভৃতি। উপন্যাসটির তৃতীয় পরিচ্ছেদে পর্যন্ত দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুবের প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামী কুরে সান্ত সাংসারিক পরিম্ডলে বিরাজমান। কুবেরের স্ত্রী মালা রূপবতী, স্নেহপ্রবণা, মন দিয়ে সে সন্তান পানল করে, স্বামীর খোঁজ খবর নেয়। রূপকথার গল্প বলে পুত্রকন্যা, স্বামী ও শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু তার পঙ্গুত্বের কারণে কুবেরের সংসারে সে মহিমাময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তার আর একটি পঙ্গুত্ব ' সে হাসিতে জানে না', সে শুধু লেখক কর্তৃক উপেক্ষিতা নয়, সময়ে সময়ে সে কুবেরের অকারণ নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে ওঠে। কন্যা গোপীর বিয়ে ব্যাপারে যুগল কী বলল মালার সেই প্রশ্নের উত্তরে কুবের বলে—

তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস— রাও করস কে রে?

মালা রাগে বই কী!

গাও জ্বালাইনা কথা দেহি খইর পারা ফোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে? গোসা হইলে মারুম গোপির মা।

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ৩৯)

আমিনবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গোপীর পায়ের স্বাভাবিকতা ফিরে এলে অনেক আশা নিয়ে মালা কুবেরকে বলেছিল তাকে নিয়ে দেখাতে। চাপে পড়ে স্তোকবাক্য দিলেও কুবেরের সময় আর হয় না। অবশেষে রাসুকে সঙ্গে নিয়ে সে একাই যায়। ফিরে এসে কুবেরের রুদ্রমূর্তি দেখে অভিমানাহত স্ত্রী বলে ওঠে:

ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডাকাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?

যা, বেড়া গিয়া মাইজা কত্তার লাগে— হারামজাদি, বদ!

কী কইলা মাঝি, কী কইলা?

তারপর কী কলহই দুজনের বাধিয়া গেল! প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কালিকাটা মালার গায়ে ছুড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ৮৭)

এ কী নৃশংসতা? একি শুধু দাম্পত্যকলহ? অথবা কুবেরের পুরুষতান্ত্রিক অধিকারবোধজনিত নিষ্ঠুরতা? দ্বিতীয় ঘটনার আগে অবশ্য পদ্মার মতো উচ্ছৃঙ্খলা কপিলা এসে গেছে তার জীবনে। কুবেরকে রোমান্টিক নায়কের মর্যাদা দিলেও সে স্বভাবত ভীরু, কুণ্ঠিতচিত্তে। হোসেন মিয়ার নৌকোর পরিচালন ভার পেলেও মাঝি শম্ভু ও বগা তাকে আমল দেয় না— স্পষ্টই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিত্ব তার নেই। কিন্তু তার বোধশক্তি ভীষণ, অপরের ব্যঙ্গোক্তিতে সে কাতর হয়। তার দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশে অসহায়ত্ববোধে আচ্ছন্ন সে। উদ্যমহীন, প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণের চিত্র ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। ধীরোদাত্ত নায়কের গুণাবলি তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেও লেখক কুবেরকেই পদ্মাতীরবর্তী ধীবরদের প্রতিনিধি হিসাবে নায়কোচিত মর্যাদা দিয়েছেন।

বন্যাবিধ্বস্ত চড়ডাঙায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কুবের শ্যালিকা কপিলাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। ভরা যুবতী কপিলা, স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা, পদ্মার মতো প্রমত্তা কপিলা, নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যায় কুবেরের জন্য তামাক সেজে আনে, পদ্মার বুকে রাত কাটিয়ে কুবের বাড়িতে এলে না চাইতেই পা ধোয়ার জল পায়, পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহুঁকি করতে হয় না। 'ঘুম আসিবার আগেই তাহাকে স্বপ্ন আনিয়া দেয়' কপিলা। সে চপচপে করে মাথায় তেল মাখে, অবাধ্য কঞ্চির মতো তার শরীর, পালং শাকের মতো তার দেহলাবণ্য। পায়ে কাঁটা ফুটে যাওয়ার ছলে কুবেরকে জড়িয়ে ধরতে যায় সে, আবার পূজা মণ্ডপ থেকে ফেরার পথে কুবের যখন তাকে জড়িয়ে ধরে তখন সোয়ামির জন্য কাতরতার কথা বলে।

ফ্রয়েডীর যৌনতার যে অভিযোগ মানিকের গল্প উপন্যাসের বিরুদ্ধে সমালোচকরা সরব, পদ্মানদীর মাঝি-তে সেই যৌনতা বোধের আভাসটুকু দিয়ে গেছেন মাত্র লেখক। উপরোক্ত ঘটনা দুটি ছাড়াও কপিলা মাঝে মাঝে 'আরে পুরুষ' : বলে কুবেরের ভীরুতাকে কটাক্ষ করে। দোলের দিন পুকুর ঘাটে চান করতে এসে কপিলা প্রগল্‌ভা হয়ে পড়ে। কুবের পাঁক মাখাতে এলে সে পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে পড়িয়া যায়। হাতে লেঠাল কলসি ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে, 'ধরো মাঝি। বলে আমারে ধরো ক্যান? কলশ ধরো।'

'ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলশির মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনই ত্রাসের ভঙ্গিতে—স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি?' (মানিক বন্দ্যোপাধায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ৯০) মনোলোভা নারী যখন ছলনাময়ী হয়, তখন পুরুষের আর কী বা করার থাকতে পারে।

গঙ্গা উপন্যাসে মাছমারা জেলেদের গঙ্গাবক্ষে ভাসমান জীবনের প্রতিচ্ছবি, সাঁইদার নিবারণ মালো, ভাই পাঁচু ও নিবারণপুত্র তেঁতলে বিলাস মুখ্য কুশীলব—সঙ্গে পার্শ্বচরিত্র হিসাবে আছে কেদমে পাঁচু, ঠাণ্ডারাম, তার ভাই সয়ারাম, ব্রজেন ঠাকুর, ফড়েনী আতরবালা, দামিনী আর হিমি, কেতুপুরের জেলেদের যেমন পদ্মাকেন্দ্রিক জীবন, এখানেও মাছমারাদের জীবন ও জীবিকার অভিমুখ গঙ্গাকেন্দ্রিক। জোয়ারভাঁটার আবহে মাছ পড়া না পড়া আবর্তে মাছমারাদের নিরালম্ব নদীনির্ভর জীবনের জলছবি। নদী আর সমুদ্রের মর্জির ওপরে বাঁচামরা এইসব মাছমারা দলের। তার ওপরে আছে আড়তদার, মহাজনের শোষণ। কাহিনি যত এগোয় বিলাসের বলিষ্ঠ জীবনচেতনার সঙ্গে এবং গঙ্গার প্রতিকূলতার সঙ্গে যোগ হয়েছে মৃত্যুচেতনা। মাছের চকের পিছনে ছুটতে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে নিবারণের মৃত্যু হয়। তার ভাই পাঁচু স্থিত, ধীর বিবেচক। গোটা উপন্যাস জুড়ে তার অস্তিত্ব। এক 'শাওন টোটায়' হাতে পায়ে ঘা নিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় সে। নৌকো সমতে জেটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঠাণ্ডারামের সলিল সমাধি। পাঁচুর চরিত্রচিত্রণ বিশেষ করে তার ধীর লয়ে মৃত্যুপথে এগিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় লেখকের বাস্তবজ্ঞান ও রূপায়ণ দক্ষতা পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। জলজীবনের এই মৃত্যুচতনার সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের এক হতাশাচিত্র

ফুটে ওঠে যখন দামিনী পাঁচুকে বলে, 'কত কী এল, কত কী গেল, কিছুই তো ধরে রাখতে পারিনি দাদা, কপাল কাকে বলে, বুঝলাম না। খালি বুঝলাম, জীবনটা ফুটো কলসী, সে কখনো ভরে না।' (গঙ্গা পৃষ্ঠা : ১২৭)

এরই প্রেক্ষিতে বিলাসের চরিত্র সাহস ও শৌর্যের প্রতীক। ভাবলেশহীন কালো কুচকুচে নাগের চোখ, কালো পাথরের মূর্তি কোঁকড়ানো চুল। কাপড় পরে নেংটির মতো, উরুতের ওপর তুলে। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ফড়ে, আড়তদার, মহাজনী নৌকোর অবিবেচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার প্রশস্ত বুকে অতলান্ত সমুদ্রের আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দেয় হিমি—দামিনী ফড়েনীর নাতনী—বলা যায় সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। বিলাস কুবেরের মতো ভীরু স্বভাবের নয়, সর্বক্ষেত্রে দ্বিধাদীর্ণ নয়। কুবেরের মধ্যে পদ্মা বুকে সংগ্রামরত জীবনচিত্র এবং গার্হস্থ্য চর্চার ভিন্ন রূপ প্রতিভাত। কিন্তু বিলাসের যাপনচিত্রে গৃহবদ্ধতার কোনো আবেষ্টন নেই। হিমি আসে পাড় থেকে নেমে, আসে নৌকোর কাছে যতটা মাছ নেবার জন্যে, তার চেয়ে বেশি বিলাসের দুর্বার আর্কষণে।

'হিমির শাড়ির পাড়ে জলের ঢেউ কেটে চলে ময়ূরপঙ্খী। পূবের বাতাস টানে আঁচল ধরে। কিন্তু অমন চোখে চোখে তাকিয়ে কী দেখে দুজনে দুজনকে। যেন দুটিতে কতকালের চেনা, হারিয়ে গিয়েছিল, ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আজ বহুদিন পরে, ভাঁটার জলে মাঝি ভাসে, আর পলিমাটির পিছনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে। চোখে চোখে বলে বলে, যেন চেনাচেনা লাগে, তুমি কি সেই মাঝি? (গঙ্গা পৃষ্ঠা : ১৪২) শাশ্বত প্রেমের এক রঙিন রেখাচিত্র। কাকা পাঁচু মনে করে — বিলাসের সাঁওটা ডাক ছেড়েছে মনের মধ্যে। সখেদে বলে ওঠে — ও যে মাছমারা সে কথা ভুলে যাচ্ছে। ডাকিনীর মায়া লেগেছে ওর। কখনো শাপান্ত করে — 'মরবি, মরবি, শোরের লাতি।' কিন্তু পীরিতি না মানে শাসন।

কুবের-কপিলার সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে পদ্মার ঊর্মিমুখর বুকে বা তার তীরভূমিতে। তেমনি বিলাস-হিমির প্রেমগাথা রচিত হয়েছে গঙ্গাকে ঘিরে। তিতাসে কিশোর ও তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটেছে তিতাসের বুকে। সুবল-বাসন্তীর বিবাহিত জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতিও তিতাসের জলে।

বিলাসকে হিমি 'ঢপ' বলে ডাকে আর বিলাস বলে 'মহারাণী'। একদিন হিমি সেজেছে তাজা ইলিশকাটা গাঢ়রঙের মতো লাল শাড়ি পড়ে। খোঁপাবাঁধা মাথার চুল তৈলচর্চিত। কপিলাও চপচপে করে মাথায় তেল মাখত। তিতাসে বাসন্তীর মাথা জবজবে তেলের বাহার। যারা পমেটম, ফেসিয়ালের নাগাল পায় না সেই অন্ত্যেবাসী রমণীরা অধিকমাত্রায় চুলে তেল দিয়ে নিজেকে সাজাতে ভালোবাসে বোধ হয়। আদিবাসী রমণীরাও উৎসবের দিনে করঞ্জার তেলে কেশবিন্যাস করে মাদলের তালে তালে নৃত্যবিঙঙ্গে মেতে ওঠে।

ময়নাদ্বীপে যাত্রার প্রাক্কালে কপিলার কিছুটা দোলাচলচিত্ততা লক্ষিত হয়। 'না গেলা মাঝি, জেল খাট।' এ কি দয়িতকে হারাবার ভয়! কেননা, তখনও কপিলা জানত না নতুন বসতিতে সে কুবেরের সঙ্গিনী হবে অথবা দিদির সংসার ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো সূক্ষ্ম অনুতাপ বোধ? 'ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনর প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। ...কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা। ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলল, আমারে নিবা মাঝি লাগে?' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২পৃষ্ঠা : ৯৪) হোসেনের স্বপ্ন সার্থক হল। 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।' কিন্তু এ ভাষা হোসেনের ভাষা নয়। তবে পরকীয়া প্রেমের বিজয় -বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাটাই কি লেখকের বাসনা ছিল?

হিমি-বিলাসের প্রেমে কোনো অবৈধতা ছিল না বলে দুজনে দুজনের কাছে অকপট। সুরেশ্বরী ভাগবতী গঙ্গা পাপনাশিনী। বিলাস অমর্তের বউ-এর সঙ্গে তার চকিত সম্পর্কের কথা বলে, 'বড়ো পাপ বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। তুমি আমার পাপ ধুয়ে দাও।' হিমির অতীত জীবনের পঙ্কিল কাহিনি শুনে বিলাস বলে, 'আমরা ধোয়ামোছা করে নিই জীবনটা।' লেখকের (কালকূট) টানা পোড়েন উপন্যাসে যেমন বলা হয়েছে 'জীবন বুনা কর চল।' এ সেই জীবনবুননের কথা —বলিষ্ঠ জীবনবাদের কথা।

বিলাসের প্রশস্ত বুকে নীলাম্বুরি অন্ধকারের মতো মহাসমুদ্র। বিলাস সমুদ্রযাত্রায় যাবে শুনে 'সেই বুকে ভেসে পড়ে হিমি বলে সমুদ্রের টান লেগেছে আমারো, আমি এখানে থাকবো কেমন করে?

—তুমি যাবে মহারাণী? অকূলে ভাসবে আমার সঙ্গে?

—সেই যে আমার বড়ো সাধ, নইলে থাকবো কোথায় গো?'

চলতি সমাজজীবনের বন্ধন হিমিদের নেই। তবে কতগুলি রীতি আছে, নীতি আছে সেগুলিকে মেনে চলতে হয়। হয়তো সে প্রথা মেনে, হয়তো ডাঙার মানুষ সমুদ্রের উদ্দামতাকে ভয় পেয়ে বিলাসের গ্রামে যাবার পথে সে নেমে পড়ে। বিদায়বেলায় বিলাস বলে, 'জোয়ারের আগনায় আসব তোমার কাছে, চলন্তায় যাব অকূলে, তখন যেন তোমার দেখা পাই।' হিমি ফিস্ ফিস করে বলতে লাগল, তাই, তাই, তাই গো, তাই থাকব আমি। তোমার যাওয়া আসার পথ চেয়ে বসে থাকব।' এ তো উপন্যাসের কেজো গদ্যের ভাষা। নয়— এ যেন স্বপ্নবন্ধ লিরিকাল কবিতা। নদী যেমন করে সাগরের অকূলে গিয়ে মেশে, বিলাস-হিমির প্রেমও মহাসাগরিক গভীরতার প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। হয়তো কিছুটা মধ্যবিত্ত রোমান্টিকতা এসে গেছে। এজন্যই কি সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'হিমি বইখানির দুর্বলতম অংশ'। অথচ বিলাসের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'সমরেশবাবুর সাহিত্যজীবনের তো বটেই, পঞ্চ-ষষ্ঠ দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি গুলির মধ্যে অন্যতম।' অবশ্যই। তবে হিমির চরিত্রায়ণ এবং প্রতিকূল পরিবেশেও তার চরিত্রমাধুর্য রসবোধ এবং জীবনকে ছেনে নেওয়ার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে লেখকের মহৎ সৃষ্টি।

উপন্যাসটির শেষ স্তবকে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সমুদ্রের অতল জলের আহ্বানে জীবনের এক চলিষ্ণু ছবি প্রতিফলিত হয়েছে—

অগ্রহায়ণ পড়ে গেছে—আঠারো গণ্ডা নৌকা—

কালীনগরের গঞ্জের ভেড়িতে—সাঁইদারের অপেক্ষায়।

সাঁইদার কে?

বিলেস, তেঁতলে বিলেস।

তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।

তিতাসে অবশ্য সে অর্থে প্রথাগতভাবে নায়ক-নায়িকার জীবনচারিতা বা উত্থানপতনের কথা লিপিবদ্ধ হয়নি। তিতাস তীরবর্তী তিতাসের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল সমগ্র মালো সমাজই এখানে প্রধান চরিত্ররূপে প্রতিভাত। ব্যক্তি মনস্কতাকে অতিক্রম করে সামগ্রিক জীবনবোধের পপরিরূপক হিসাবে নদীর অনুষঙ্গ, নদী, মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক চিত্রায়িত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এবং জীবিকার তাড়না গীতিময় ভাষায় ধ্বনিতরঙ্গে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। কোনো ব্যক্তির বিকাশ এখানে প্রাধান্য পায়নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোনো ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন কোনো বিশেষের প্রতি পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়।' ব্যক্তিজীবনের নিয়ন্তকের মতো মহাকালরূপী তিতাস বয়ে চলেছে ধীর গতিতে, যে নদী পদ্মার মতো প্রমত্তা নয়, ব্যক্তিমানুষের উত্তরণ এবং সংকটও এখানে ঘটেছে ধীরলয়ে গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে।

কিশোর এবং তার মালাবদল করা স্ত্রীকে যদি প্রথাগত অর্থে নায়ক-নায়িকা ধরা যায় তাহলে বলতে হবে বোধনের আগেই বিসর্জন। প্রবাসখণ্ডে গোকনঘাটের সদ্য যুবক কিশোর পাড়ি দেয় মেঘনার বুকে। শুকদেবপুরে কাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে তার সাদর অভ্যর্থনা। দোল পূর্ণিমার মিলনোৎসবে দেখা গেল 'সেই মেয়েটিকে', সে পঞ্চদশী। 'কিশোরের গালে আবির দিতে মেয়েটির হাত কাঁপিল; বুক দরু দুরু করতে লাগিল। তার ছন্দময় হাতখানার কোমল স্পর্শ কিশোরের মনের রহস্যলোকের পদ্মারাজে ঘোমটা-ঢাকা দলগুলিকে একটি একটি করিয়া মেলিয়া দিল। সেই অজানা স্পর্শের শিহরণে কাঁপিয়া উঠিয়া সে তাকাইল মেয়েটির চোখের দিকে। সে চোখে মিনতি। সে-মিনতি বুঝি কিশোরকে ডাকিয়া বলিতেছে: বহুজনমের এই আবিরের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমারই জন্যে। তুমি লও। আমার আবিরের সঙ্গে তুমি আমাকেও লও।' (তিতাস একটি নদীর নাম পৃষ্ঠা : ৪৩০)

কিছুদিন পরে মোড়লগিন্নির তৎপরতায় তাদের মালাবদল হয়ে গেল। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কিশোরদের অর্জিত অর্থ ডাকাতরা লুণ্ঠন করে এবং নবপরিণীতা স্ত্রীকে অপহরণ করে। তীব্র মানসিক অভিঘাতে কিশোর পাগল হয়ে যায়। ঘটনাপ্রবাহে পরবর্তীকালে নতুনবউ শিশুপুত্র অনন্তকে নিয়ে কিশোরদের গ্রামে আশ্রয় পায়— হালের সুতো কেটে তার জীবিকানির্বাহ হয়। তার পরিচয় 'অনন্তের মা'। স্বামীকে চিনতে পারলেও ভারসাম্যহীন কিশোরের কাছ নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি। ওদিকে দেশে ফিরে সুবলের সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে হয়। স্বল্পকাল পরেই মাছ ধরতে গিয়ে নৌকোচাপা পড়ে সুবলের মত্যু। বিধবা বাসন্তীই এখন অনন্ত মা-র-সুখ দুঃখের সাথী।

এক বসন্তোৎসবে কিশোর তার স্ত্রীকে লাভ করেছিল, চার বছর পরে আর এক ফাগ উৎসবে অনন্তর মা দেবতা রাধামাধবকে আবির দেওয়ার আগে পাগলের চুলদাড়িতে আবির মাখিয়ে দেয়। পাগল 'আমার আবির কই' বলে এক ধাক্কায় আবিরের থালা ফেলে দেয়। হতবাক বাসন্তীর প্রশ্নের উত্তরে অনন্তের মা বলে, 'জানি গো জানি, মানুষ হারাইয়া পাগল হইছে।'

'তুমি ত তার মনের মানুষ মিলাইয়া দিতে পার না।'

'তা পারি না, তবে চেষ্টা কইরা দেখতে পারি, আমি নিজে তার মনের মানুষ হইতে পারি কি না।'

এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বঞ্চিত নারীর গোপন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এই বাক্যবন্ধে। সে মানসিকভাবে রিক্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত। তার ধারণা হয়েছিল তাকে দেখতে দেখতে পাগল একদিল ভালো হয়ে উঠবে। পরের বছর দোলের দিন পাগল কিশোর এক মুঠো আবির অনন্তর মার কপালে আর গালে মাখিয়ে দিল। সে ক্ষিপ্রগতিতে তার প্রেয়সীকে পাঁজাকোলা করে উঠোনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল আর গলা ফাটিয়ে বলল, 'তেল আন, জল আন, তোমার মাইয়া মূর্চ্ছা গেছে।' পাঁচ বছর আগে দোল-উৎসবে যখন বাসুদেবপুর এবং শুকদেবপুরের অধিবাসীদের লাঠালাঠিতে এ মেয়ে মূর্ছা গিয়েছিল তখনও কিশোর তাকে পাঁজাকোলা করে চিৎকার করেছিল, 'এর মা কই...জল আন, পাংখা আন।' তবে কি তার পূর্ব স্মৃতি ফিরে এসেছিল? অতঃপর সমবেত পল্লিবাসীর পাগলকে গণপ্রহার। সংজ্ঞা ফিরে এলে এতদিন পর তার স্বাভাবিক উচ্চারণ 'বাবা, আমারে একটু জল দে।' পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই কিশোরের মৃত্যু হল। 'অনন্তর মা মরিল চারিদিন পরে।' বড়ো করুণ হৃদয়বিদারক এই মৃত্যু। এ যেন তিতাস নদীর মৃত্যুর পূর্বাভাস।

তিতাসকে ঘিরে যে যে স্পন্দিত জীবনপ্রবাহ গড়ে উঠেছিল একদা, পরবর্তীকালে তা মৃত্যুতরঙ্গে ভাসমান। মালোপাড়ায় একের পর এক মৃত্যুসংবাদ শুধু নয়, সুসংবদ্ধ গোষ্ঠীচেতনা যে মহান সংস্কৃতিকে ধারণ করেছিল তাতেও ভাঙন ধরে। অনন্ত লেখাপড়া শিখে নাগরিক জীবনের অংশীদার হয়ে ওঠে। তবলাবাজিয়েরা যাত্রার চটুল গালের আমদানি করে। মালোদের সংগীত সত্তা যা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তার স্রোতও শুষ্ক হয়ে আসে। শুষ্ক বুকে জেগে ওঠা চর মালোপাড়ার জন্য নতুন জীবন স্পন্দন নিয়ে আসে না।

রুশ লেখক মিখাইল শলোখভ তার চার খণ্ডের ধীরে বহে ডন নামের মহৎ উপন্যাসে নদী নির্ভক কসাক জনগোষ্ঠীর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তীব্র জীবন কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। উপন্যাসটির শেষে এক নতুন জীবনের সুর অনুরণিত হয়েছে। সেই প্রাণবতী আশার সঞ্জীবনী বাণী তিতাসের মৃত্যু কথা আমাদের শোনাতে পারেনি। ১৯০৪ সালে আইশির নাট্যকার জর্জ মিলিংটন সঞ্জী রাইডার্স টু দি সি নামিত এক বিখ্যাত একাঙ্কিকায় স্কটল্যান্ডের এারান দ্বীপপুঞ্জের এক জেলে পরিবারের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—মরিয়ার পরিবারের দুজন মাছ ধরতে গিয়ে একের পর এক সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তিতাসের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত ক্রমাবলুপ্তিও সেরকম মহাবিয়োগান্তক পরিস্থিতির সম্মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়।

উপন্যাসের শেষাংশে শ্রেণিসম্পর্ক ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপটি প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। মালোদের নিজস্ব জাল ছিল না, নৌকো ছিল না। যখন তারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্দশার চরমসীমায় উপনীত, তখনই ঋণ আদায়ের ফাঁদে আটকে পড়ে— স্বাধীনবৃত্তি হারিয়ে দিনমজুর ও শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চরে মালোদের জমির অধিকার নেই।

অর্থবলী জমিদার এবং তাদের আজ্ঞাবাহী বাহুবলিরা সে চরের দখল নেয়।

গঙ্গা উপন্যাসেও এই অর্থনৈতিক লড়াইটি অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মাছমারাদের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অসম লড়াই, প্রাকৃতিক নির্মমতার বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম। অপরপক্ষে মহাজন আর আড়তদারেদের হাতে তাদের নিয়ত শোষণকাহিনি।

পদ্মানদীর মাঝি-তে জীবনবাদী লেখক পদ্মার প্রতিকূলতার প্রেক্ষিতে ধনঞ্জয়, শীতল, মেজোবাবু, কেদারনাথদের হাতে শোষণ প্রক্রিয়াটি নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। এই শোষণের স্বরূপটি সর্বাত্মক আকার ধারণ করেছে রঙ্গমঞ্চে হোসেন মিয়ার আবির্ভাবের পর। প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসে মলিন ছিন্নবস্ত্র তার দেহে, রুক্ষ উলুঝুলু তার চুল। এখন তার তৈলচিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে আবৃত। মেহেন্দি রঙে সজ্জিত দাড়ি। সে নিজের পানসিতে পদ্মা পাড়ি দেয়। সে এক বিপদ সংকুল দ্বীপে মনুষ্যবসতির স্বপ্ন দেখে। সে গীতরচনা করে, গান গায়। সে গানে নিদ্রা থেকে জাগরণের সুর ভাসে। সেজন্য কোনো কোনা মহলে তাকে রোমান্টিক স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিড়ি, পাট, গুড়, আফিং-এর চোরাচালানের মাধ্যমেই তার আর্থিক আধিপত্য। এই উদ্যমী পুরুষটির প্রতি লেখকের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে মনে হয়, যখন দেখি সপ্তম ও শেষ পরিচ্ছেদটি পরিবূর্ণভাবে হোসেন মিয়া এবং তার কার্যকলাপের বিবরণীতে পরিপুষ্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকেই কেতুপুরের ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্রাত্য জেলেদের জীবনে অপরিহার্য নিয়ন্তারূপে ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মোচিত করে। অসহায় এই বৃত্তিজীবীর খেয়ালি পদ্মার কাছে জীবিকার জন্যে যে সমর্পিত, তেমনি হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার কাছে তাদের নিরুপায় ও বিস্ময়মিশ্রিত আত্মসমর্পণ। হোসেন যেন পুতুলনাচের দক্ষ বাজিকর। 'লাল রঙের দাড়ির ফাঁকে সবসময়েই মিষ্টি করিয়া হাসে।' ধনীদরিদ্র ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য নেই তার কাছে। তাকে কেউ কোনোদিন রাগতে দেখেনি।

কুবেরকে যখন প্রথমবার ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় সে এক রুদ্ধশ্বাস সমুদ্রযাত্রা। লেখকের নিরন্তর অন্বেষণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে পরিবেশের নিগূঢ় সংযুক্তি। চাঁদপুর স্টিমারঘাট থেকে নোয়াখালি পেরিয়ে মেঘনার মোহানায় ছোটো বড়ো দ্বীপ পেরিয়ে বাইশ ডিগ্রি অক্ষাংশ আর একানব্বই ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ যেখানে পরস্পরকে অতিক্রম করেছে সেখানেই ময়নাদ্বীপের অবস্থান। হোসেন সবই জানে, সে দেশবিদেশ ঘুরেছে। মানচিত্র পেতে কুবেরকে ভূ-অবস্থানের জটিলকথা বোঝাতে যায়। হোসেন কম্পাসের ব্যবহার জানে, সমুদ্রবক্ষে আবহাওয়া পরিবর্তনের খবর রাখে সে। বিভিন্ন লেখায় মানিক তাঁর বিজ্ঞান চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন। লেখকের বিস্তৃত ভৌগোলিক চেতনা ও বিজ্ঞান-মনস্কতা এই অধ্যায়টিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

হোসেন চরিত্রে কিছু গুণের সমারোহ দেখা গেলেও তার স্বপ্নের ময়নাদ্বীপে যে কোনো উপায়ে দাসশ্রমিক সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য। কুবেরের বাড়ির চালে আফিমের বড়ি গুঁজে রাখা, ঢেঁকিঘরে রাসুর চুরি করা পীতমের ঘটির সন্ধান পাওয়া— এসবই তার বৃহত্তর পরিকল্পনার খণ্ডচিত্র। কপিলা যখন কুবেরকে বলে, 'না গেলা মাঝি, জেল খাট।' হতাশ বোধে বিদ্ধ কুবেরের উক্তি, 'হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা, একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।' কুবেরের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব, তার মানসিক অস্থিরতা ও নৈতিক সংকটের প্রতিফলন ঘটেছে এই বাক্যবন্ধে। কুবের এখানে ভাগ্যের হাতে অসহায় ক্রীড়নক। গ্রিক নিয়তির মতো তার জীবন প্রক্রিয়া হোসেন নির্দিষ্ট। কেবলমাত্র হোসেনের নিয়তিই স্বয়ংনির্দিষ্ট। রোমান্টিকতা নয়, প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী সমাজতন্ত্রের জীর্ণতার অবসানে ধনতন্ত্রের অমানবিক রূপটি যথার্থ প্রত্যক্ষ করেছেন হোসেন মিয়ার মধ্যে। 'সামন্ততন্ত্র থেকে যে ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির দিকে পৃথিবী সরে আসছে তার বিকৃতি উপলব্ধি করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটুও দেরি হয়নি। ১৯৩০-৩৪ এর মধ্যেই সামন্ত্রতন্ত্র ও নয়াধনতন্ত্র তথা আধুনিক পুঁজিবাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো কতখানি স্বচ্ছ হযে গিয়েছিল তাঁর কাছে তারই নিদর্শন হোসেন মিয়ার চরিত্রচিত্রণ আর ময়নাদ্বীপের রূপক।' (প্রমিথিউস জুলাই ১৯৯০) মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগেই নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের নিয়ন্ত্রক অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন মানিক। তাঁর মতে 'নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়।' সেজন্য জীবনকে দর্শন করার অবিরাম শ্রম তিনি করে গেছেন।

হোসেন বেছে বেছে তার দ্বীপে প্রজননক্ষম পুরুষ ও নারীকে নিয়ে যায় যারা প্রতিকূল পরিবেশে অবিরাম পরিশ্রমে কুমারী জমিকে চাষযোগ্য করে তুলবে এবং সন্তানের জন্মদানে লোকসংখ্যা বাড়াতে পারবে। সেজন্য বৃদ্ধ বসির মিয়ার স্থান হয় না সেই দ্বীপে। হোসেনের কারসাজিতে তার তরুণী ভার্যা থেকে যায় বিবাহিত এনায়েতের সঙ্গে, মৃতদার আমিনুদ্দির নতুন করে নিকা হয় নৌকোর মধ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনেই কুবের ও কপিলাকে প্রয়োজনে ময়নাদ্বীপে, পরে গোপী ও তার বরকেও নিয়ে যাওয়া হবে।

এখানে ঊর্বরতাতত্ত্বের মতাদর্শটিও প্রাধান্য পেয়েছে। কুরুবংশের যথার্থ উত্তরাধিকারীর সন্ধানে সত্যবতী তাঁর কানীনপুত্র ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে আহ্বান করেছিলেন পুত্রবধূদের। রূপসি বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীকে পাঠানো হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ করে রাজা লোমপাদের রাজধানীতে আনয়নের জন্য। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ হল, অবসান হল নিদারুণ খরার। স্নাত হল ঊষরভূমি। পৃথিবী ও নারী উভয়েই হল ঊর্বরা। ময়নাদ্বীপের অধিবাসীরা 'জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে সব তাদের সম্পত্তি, খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবি করিবে না। নিজেদের জীবিকা তাহারা যতদিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত জোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২ পৃষ্ঠা : ৭৪)

কর্মক্ষম মানুষের কর্মদক্ষতায় জমি হবে চাষযোগ্য, প্রজননক্ষম পুরুষের দ্বারা নারীদের গর্ভে সঞ্চারিত হবে নতুন ভ্রূণ— হোসেনের ক্ষমতার বিস্তার হবে। কেবল বুত্তিজীবী মানুষেরা শ্রমদাসে পরিণত হবে। ধনতান্ত্রিক ক্ষমতায়ন এই শোষণের রূপকেই প্রকাশ করে।

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসেই এক অনতিক্রম্য অমোঘ নিয়তির হস্তক্ষেপ লক্ষণীয়। পুতুলনাচের তিকথা-য় কুসুমের বাবা অনন্ত শশী ডাক্তারকে বলছে, 'পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' শশী অবশ্য হেসে বলেছিল, 'তাকে একবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিতাম।' কেতুপুরের মানুষেরা অবশ্য তাকে হাতের কাছে পেয়েও তার হাতে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। গঙ্গা-তে মাছের প্রতুলতা, অপ্রতুলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মাছমারাদের জীবন। একে একে মৃত্যু, হতাশা, শেষে হিমি-বিলাসের মিলনপথেও হিমির সমুদ্রভীতি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। মানুষের মন বাঁধা সুখের সন্ধান করে অথচ নদী আর সমুদ্রের মর্জির কাছে বাঁধা আছে মাছমারাদের নিয়তি। তিতাসের প্রারম্ভে লেখকের মন্তব্য: 'নদীর একটি দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে, কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই, নদীরও বহার শেষ নাই।' বইতে বইতে তিতাস একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার গতিপথ একদিন রুদ্ধ হয়ে যায়।

আলোচ্য উপন্যাসত্রয়ীতে নদীর মতো ভাষাও জীবনের প্রবহমানতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। 'শৌখিন মজদুরি'র কোনো প্রচেষ্টা নেই। মানিক ব্যবহার করেছেন পদ্মানদীর জেলেদের ভাষা তাদের কথোপকথনে আর ঘটনার বিবরণ বা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন স্বাদু সাধুভাষায় এর ফলে সামগ্রিক উপস্থাপনা পেয়েছে তীব্র গতিশীলতা। তিতাসের ভাষায় তার মৃদু স্রোতের মতো জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পদ্মা-গঙ্গার উচ্ছলতা তিতাসে নেই। তার শান্তশ্রীর মতো ভাষাও হয়ে উঠেছে শ্রীময়ী। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার যেন তিতাসের দুই পারের মতো স্থানিক উচ্চারণকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছে। গঙ্গা-তে কিছু নাগরিক ভাষারীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু মাছমারাদের কথাবার্তা ও তাঁর বাক্‌রীতি ও বাচনভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতীকী তাৎপর্য, রূপক ও শিল্প চিত্রকল্প নির্মাণে এই ভাষার হিরণ্যদ্যুতি মনের চোখকে ঝলসে দেয়। তিনটি উপন্যাসের সংলাপই চিরকালীন কথাশিল্প হয়ে থাকবে।

ভিন্ন ভিন্ন নদী ও তার তীরবর্তী বা নদীনির্ভর আঞ্চলিক বৃত্তিজীবীদের নিয়ে শুরু করলেও তিনটি উপন্যাসই আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যের মহাসমুদ্রে তাদের অবস্থিতি সুনিশ্চিত করেছে। বঁটির ওপরে নাচতে নাচতে যে ছেলেটি নিজের পেট কেটে ফেলেছিল তার নাম ছিল প্রবোধ। তিনিই পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বিতর্কিত বহুমাত্রিক লেখক হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সার্বিকভাবে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা তাঁর হাতেই প্রথম।

তাঁকে জন্ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ঋণস্বীকার

১। পদ্মানদীর মাঝি— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী)
২। গঙ্গা— সমরেশ বসু, (মৌসুমী)
৩। তিতাস একটি নদীর নাম—অদ্বৈত মল্লবর্মণ/অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র (দে'জ পাবলিশিং)
৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (দে'জ পাবলিশিং)
৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য— সরোজমোহন মিত্র, গ্রন্থালয়
৬। Riders to the Sea - J. M. Synge, O.U.P
৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (দে'জ পাবলিশিং)
৮। কালের প্রতিমা — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৯। অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস— গুণময় মান্না, উত্তরাধিকার, বইমেলা ১৯৯৬
১০। হোসেন মিয়া ও ময়না দ্বীপ— সুমিতা চক্রবর্তী, প্রমিথিউস, জুলাই ১৯৯০
১১। নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস — প্রভাসচন্দ্র সামন্ত, প্রভা